

সূচি

১. মসজিদের দুইটি অবস্থা	১৩
২. মসজিদ শব্দটির উৎপত্তি এবং আল্লাহর আয়াত	১৩
৩. কোরান ও হাদিসে মসজিদের স্বরূপ	১৬
৪. 'নফস'-এর চারটি পর্যায়	১৭
৫. সূরা আ'রাফ (২৯-৩২ আয়াত)	১৯
৬. আল্লাহর রেজেক	২৪
৭. সূরা তৌবা (১৭-১৯ আয়াত)	২৭
৮. কোরান মজিদে মোমিনের সংজ্ঞা স্বরূপ	৩৪
৯. মসজিদেই ধীন ইসলাম ও তৌহিদ	৩৮
১০. দুই প্রকার ধীন	৩৯
১১. আল্লাহর ধীন ও মানুষের ধীন	৪১
১২. ধীন, দুনিয়া ও পরকাল	৪৬
১৩. ধীন, মসজিদ ও দুনিয়া	৫০
১৪. বিশ্বাসীর দুনিয়া ও উহার সীমারেখা	৫১
১৫. ধীন ইসলাম সম্বন্ধে ভুল ধারণার মূল কারণ	৫৪
১৬. দুনিয়া ও ধীনের পরিধি এবং ইহাদের সঙ্গে কেতাবের সম্বন্ধ	৫৫
১৭. সূরা কাফেরুনে আল্লাহর ধীন	৫৭
১৮. বিশ্বপ্রকৃতি ও অন্তরপ্রকৃতি	৬৩
১৯. শাক্কালাইন	৬৫
২০. কেতাব ও বিজ্ঞান	৬৭
২১. কেতাবে রাক্বুল আলামীনের আবর্তন	৭৩
২২. 'কোরান ও কেতাব'-এর পরিচয় সম্বন্ধে দু'টি মন্তব্য	-৭৫
২৩. 'কেতাব ও কোরান'-এর তুলনামূলক সংজ্ঞা এবং তাহাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটি মন্তব্য	৭৬
২৪. আল্লাহর ধীন, কেতাব ও কোরানের পার্থক্য কী?	৭৮
২৫. কেতাবের সঙ্গে মানুষের বিরোধ	৮০
২৬. একটি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর	৮১

২৭. আল্লাহতা'লার রবরূপ	৮৩
২৮. রুহ	৮৭
২৯. আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব ও রুহ	১০৩
৩০. আর্শ ও কুরসী	১০৬
৩১. তাওত পরিচয়	১০৮
৩২. আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব ও বাইতুল মা'মুর	১০৯
৩৩. কেয়াস	১১৩
৩৪. নূরে মোহাম্মদীর একটি কথা	১১৩
৩৫. রহমতুল্লিল আলামীন	১১৪
৩৬. অবতীর্ণ বাণীতে 'এবং' শব্দের অত্যধিক ব্যবহার	১১৮
৩৭. সাত হরফের দ্বন্দ্ব	১১৮
৩৮. বেহেস্ত	১২০
৩৯. বেহেস্তের প্রস্থ আসমান ও জমিন ব্যাপ্ত (কোরান)	১২২
৪০. বেহেস্তের উত্তরাধিকারীত্ব	১২৩
৪১. বেহেস্ত লাভ করিবার আমল	১২৩
৪২. জাহান্নাম কর্তৃক পিছন আক্রমণ	১২৬
৪৩. 'আল্লাহর রেজেক'-এর একটি উদাহরণ	১২৮
৪৪. অবিশ্বাসী অন্ধকারে বাস করে	১২৯
৪৫. জীবনমান ও ইসলাম	১৩০
৪৬. দ্বীন ইসলামে বস্তুবাদের স্থান	১৩১
৪৭. ইসলামী বস্তুবাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস	১৩৩
৪৮. মসজিদ কাহাকে বলে	১৫৬
৪৯. মসজিদ তৈরি করিবার নিয়ম ও উহার আদব শিক্ষা	১৫৮
৫০. মসজিদ সংক্রান্ত মাসলা শিক্ষা	১৬১
৫১. মসজিদ তৌহিদ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি	১৬২
৫২. প্রজ্ঞার মসজিদ	১৬৪
৫৩. হাদিস গ্রন্থে মসজিদ	১৬৭
৫৪. ইসলামে বৈরাগ্য	১৭৫
৫৫. সুরা কাহাফে মসজিদ	১৯০
৫৬. সুরা হজে মসজিদ	২১৯

৫৭. সাধকদের কয়েকটি উক্তি	২২১
৫৮. মসজিদ ও কবর	২৬০
৫৯. মসজিদ চারি প্রকার	২৩৩
৬০. কেবলা	২৩৫
৬১. অহাবী মতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	২৬২
৬২. আনা কাশারুম মিসলুকুম-এর ব্যাখ্যা	২৬৪
৬৩. কোরানের ভাবধারায় পীর-মুরিদের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ	২৮৪
৬৪. সুফিবাদের যৌক্তিকতা	২৮৬
৬৫. সুফির পীর বা সাকী (গুরু)	২৮৯
৬৬. শরীয়ত ও তরীকত	২৯২
৬৭. আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব ও মেরাজ	২৯৫
৬৮. উপসংহারে মসজিদ	৩০২
৬৯. শাহপীর চিশতীর রওজা জেয়ারত	৩০৫

মসজিদের দুইটি অবস্থা

'মসজিদ' শব্দটির অন্তর্নিহিত ভাবধারা বিশেষ অনুধাবনের বিষয়। এবং তাহা বুঝিয়া লইতে না পারিলে মসজিদে গমনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে মানুষের পূর্ণ পরিচয় লাভ হইতে পারে না। মসজিদকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে : নিরাকার ও সাকার; ভিতর এবং বাহির। প্রত্যেক বিষয়েরই এই দুইটি দিক রহিয়াছে।

অভ্যন্তরীণ তত্ত্ব না বুঝিলে বাহিরের দিকটি নিরর্থক ও মূল্যহীন। আবার বাহির বা উহার সাকার অস্তিত্ব না থাকিলে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উহার অভ্যন্তরীণ মূল্যবোধ জাগ্রত করিয়া তোলাও যায় না। সেইজন্য সামাজিক দিক হইতে বাহিরের প্রয়োজন অত্যধিক। পক্ষান্তরে, কেবল বাহির রক্ষা করিয়া চলিলে ধর্মীয় কর্তব্যগুলি অনুষ্ঠানসর্বশ্ব হইয়া উহা প্রাণহীন ও অবহেলার বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

ইসলামী চিন্তাধারার মূল ভিত্তি মসজিদ। মসজিদকে বাদ দিয়া কোনও কর্ম করিলে তাহাই দুনিয়া। দুনিয়া মুসলমানের জন্য হারাম। আজ পৃথিবীর বুকে ইসলামী মতবাদের এই মূল ভিত্তি অহাবী মতবাদের প্রবল প্রতাপ ও চাপে পড়িয়া একেবারেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই কোরান-হাদিসের মসজিদকে বাদ দিয়া ইট-পাটকেলের গড়া বস্তু-মসজিদকেই দুনিয়ার মুসলমান আঁকড়াইয়া ধরিয়া লইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, মসজিদের বাহিরে থাকিয়া জীবনযাপন করিলেও তেমন আপত্তির কারণ থাকিত না, যদি মসজিদ পরিচয় সঠিক রাখিয়া উহাতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা অন্তত কিছু কিছু রক্ষিত হইত। তাহা না করিয়া শুধু ইট-পাটকেলের মসজিদকে আঁকড়াইয়া ধরা আর সোনা ফেলিয়া আঁচলে গিরা দেওয়া সমার্থক।

মসজিদ শব্দটির উৎপত্তি এবং আশ্রাহর আয়াত

'সেজদা' হইতে মসজিদ শব্দের উৎপত্তি। মসজিদ অর্থ 'সেজদা'-এর স্থান। কাজেই সেজদা শব্দের প্রকৃত ভাব জানিয়া লওয়া খুবই দরকার। আমরা সেজদা বলিতে স্রষ্টার নিকট মস্তক অবনত করিয়া সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ভাব প্রকাশ করা বুঝিয়া থাকি, কিন্তু এই কাজ সেজদার তথা আত্মসমর্পণের কেবল চেষ্টা বা মহড়া মাত্র। আমিত্বের লোপসাধন যখন হয় এবং নফস আপন অনুভূতি ও চেতনা হইতে যখন সরিয়া যায় তখনই হয় নফসের সেজদা। বৃক্ষাদি ও তারকাসমূহ কোরান মতে সেজদায় আছে— ইহার অর্থ

তাহারা নিজ ইচ্ছায় চলে না, চলিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই। মানুষের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি নিজ ইচ্ছা বিসর্জন দিয়া আল্লাহর ইচ্ছার উপরে নিজেকে ফেলিয়া দেয় তবেই হয় তাহার সেজদা।

হযরত মুসা (আ) যখন আল্লাহর নূরের জ্যোতি দর্শন করিলেন তখন তাহার ইন্দ্রিয়বোধ পৃথিবীর দিক হইতে অচেতন হইয়া পড়ে, অই তিনি জ্ঞানহারী দশায় ধরাশায়ী হইয়া পড়েন। এইখানেই তাহার প্রকৃত সেজদা ও আত্মদর্শন। সুরা সেজদার ১৫ সংখ্যক আয়াতে আছে—“নিশ্চয় যাহারা আমাদের আয়াতে বিশ্বাসী তাহারা ঐ সকল লোক যখন তাহারা আয়াতের জিকিরে (অর্থাৎ পরিচয়ের সংযোগে) আসে তখন অজ্ঞান হইয়া সেজদায় পড়িয়া যায়”।

কাজেই দেখা যায়, সেজদার প্রকৃত অবস্থা তখনই হয় যখন নফস স্বর্গীয় সুপ্রভাবে তাহার পার্থিব চেতনা হারাইয়া ফেলে, এবং মানবীয় অনুভূতি তাহার নফসের সীমা ডিঙাইয়া অতীন্দ্রিয় জ্ঞানরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখনই প্রকৃত জীবন লাভ হয় যদিও মানব-ইন্দ্রিয় তখন পার্থিব চেতনা সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলে। সুতরাং দেখা যায়, প্রকৃত সেজদার স্থানে বা সময়ে দুনিয়া নফস হইতে বিদায় লয়। পৃথিবী ঠিক তেমনই বিদ্যমান থাকে কিন্তু নফস উহার সঙ্গে মানবীয় সংশ্রব বর্জিত অবস্থায় থাকে। এই অবস্থা সত্যিকারের মসজিদের চরম রূপ। এই চরম উদ্দেশ্য জীবনে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্যই আমরা সাধারণভাবে মসজিদের সংজ্ঞা দিয়া থাকি এই বলিয়া যে, “আল্লাহর রাজত্ব অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠার জন্য দুনিয়ার খেয়াল-বর্জিত অবস্থা ও স্থানই মসজিদ।” সত্যিকার মসজিদের এই চরম রূপটি জীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য নিয়মিত চেষ্টা ও অনুশীলনের উপযোগী যে স্থান ও ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে ইহাই আমাদের জাহেরী মসজিদ। হাকীকতে পৌছাইয়া দেওয়াই জাহেরী মসজিদের চিরায়ত লক্ষ্য।

সেজদা করিতে চাহিলে সালাত প্রয়োজন। সালাতের কোরানী পরিভাষাগত সংক্ষিপ্ত অর্থ—আল্লাহর সহিত নিবিড় সংযোগ প্রচেষ্টা। কোরানে বলিতেছেন, “ইন্না সালাতা লে জিকরী” অর্থাৎ “নিশ্চয় সালাত আমার (সহিত) সংযোগের জন্য”। সালাত সাফল্যমণ্ডিত হইলে মসজিদ তৈরী হইয়া যায়। মসজিদ তৈরী হইয়া গেলে সেজদার অবস্থা তৈরী হইয়া যায় এবং সেজদা সহজসাধ্য হইয়া যায়।

হাকীকতের এই সমস্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে মসজিদের আদব ও মসজিদ সংক্রান্ত মাসলা*গুলি জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। আবার মসজিদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিলে মসজিদ সংক্রান্ত মাসলাগুলির তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা যাইবে। তাই ঐসব কথা লেখা দরকার মনে করিলাম না।

‘আয়াত’ শব্দটির কোরানী অর্থ বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। সৃষ্টির প্রত্যেকটি বস্তু আল্লাহর ‘আয়াত’, অর্থাৎ চিহ্ন, নিদর্শন ও পরিচয়। আল্লাহ হইতে সমগ্র সৃষ্টির আগমন এবং তাঁহারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। সৃষ্টিকে যতক্ষণ আমরা বাহ্য চক্ষু দ্বারা দেখিয়া থাকি ততক্ষণ উহাকে আল্লাহর চিহ্নরূপে চিন্তা করিলেও উহা আল্লাহর পরিচয় দান করে না এবং উহা আল্লাহর নিদর্শনরূপে প্রকাশ পায় না। কারণ মূলতঃ সমস্ত সৃষ্টি তাঁহারই পরিচয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও বাহ্য চক্ষু দ্বারা এইগুলিকে তাঁহার আয়াতরূপে দেখা সম্ভব নহে।

যখন তাঁহার দয়া অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার কোনও দাসের আমিত্বের আবরণ ছিন্ন করিয়া ফেলেন তখন বাহ্য চক্ষুর অভ্যন্তরীণ অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তি তাহার খুলিয়া যায় এবং সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার পরিচয় এককভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। তখনই বুঝা যায় যে, প্রত্যেকটি সৃষ্টি তাঁহার এক একটি ‘আয়াত’, কারণ সৃষ্টি আসলে যে, আল্লাহর নূরেরই রূপান্তরিত বিকাশ, তাঁহার অভ্যন্তরীণ সেই আসল প্রকৃতি কেবল তখনই দৃশ্যমান হয়।

‘আয়াত’-এর এইরূপ অর্থ গ্রহণ না করিলেও আমরা ত সর্বক্ষণ তাঁহার নিদর্শনগুলির সংযোগেই রহিয়াছি। নূতন করিয়া সংযোগের কথা উঠিতে পারে না, কারণ বস্তু-সংযোগ ব্যতীত নিত্যকার মানব জীবন অসম্ভব। তাহা ছাড়া আয়াতের সংযোগে আসিলে হতচেতন হওয়ার প্রশ্নও আসে না।

কোরানে বলিতেছেন, “আল্লাহ নুরুসসামাওয়াতে অল আরদ।” অর্থাৎ আসমান ও জমিন তথা সমস্ত সৃষ্টির নূর স্বয়ং আল্লাহ। কিন্তু তিনি দুনিয়ার আমিত্ব বিশিষ্ট দৃষ্টি হইতে তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছেন। সৃষ্টি রহস্যের মূলে দৃষ্টি নিক্ষেপ দুনিয়াদারের জন্য অসম্ভব। এই জন্য কোরানে দুনিয়াবাসীকে অন্ধ আখ্যা দিয়াছেন। আমিত্ব চূর্ণ হইয়া গেলেই প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার নূরই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

ভাষায় লিখিত কোরানের প্রত্যেকটি বাক্যকেও একটি ‘আয়াত’ বলা হয়, কারণ, কোরানের বাক্য দ্বারা আল্লাহর পরিচয় প্রকাশের চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু এই অর্থে ‘আয়াত’ শব্দটি কোরানে ব্যবহার করা হয় নাই।

*মাসলা অর্থ ব্যবহারিক নিয়ম।